বোকার স্বর্গ

আকাশ মালিক

(প্রকাশিতব্য বইয়ের একটি প্রবন্ধ)

(পর্ব- ৫)

প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার নামই বিজ্ঞান, আর কোনো প্রশ্ন না করে বিশ্বাস করার (মেনে নেওয়া) নামই ধর্ম। বিজ্ঞান জানা আছে বলেই মানুষ জলে চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করতে পারে। আগুন ছাড়া, পাতিলের জলে চাল ঢেলে একলক্ষ চব্বিশ হাজার বার 'বিসমিল্লাহ' বলে জলে ফুঁক দিয়ে, কিংবা সারা কোরান শরিফ সেই পাতিলে ডুবিয়ে চাল ফুটাতে কেউ যদি চেষ্টা করে, চাল কি একটাও ফুটবে? নিশ্চয়ই ফুটবে না। শিক্ষিত লোকেরা যদি বলেন বিজ্ঞান কেন মহাবিজ্ঞান দিয়েও একটা ভাতও ফুটানো যাবে না, যদি আল্লাহর হুকুম না হয়, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কার কাছে পাওয়া যাবে? আমাদের দেশের চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বুর প্রশ্ন রেখেছিলেন : "মুসলমানের দুই স্কন্ধে দুইজন ফেরেস্তা পাপ-পূণ্যের ধারাবিবরণী লিখতে, কাগজ-কলম হাতে, মানুষের ঠিক কতো বছর বয়সে তাদের ওপর সওয়ার হন, মানুষ কখন টের পায় এরা এসেছেন?" পৃথিবীতে কতো বড় বড় মহাজ্ঞানী মুসলমান আছেন, কেউ মুখ খোলে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নগুলোর একটিরও জবাব দিতে এগিয়ে আসলেন না, পারলেন না। আজকাল পৃথিবীর কোথাও একটি বোমা পড়লে ইসলাম ও মুসলমানের নাম চলে আসে কেন, কেন মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ, এত দল? প্রত্যেক দলই নিজেকে প্রকৃত মুসলমান ও অন্যসব দলকে নকল বা অমুসলিম বলে? শুধুমাত্র তারাই কোরানে এবং ইসলামের ইতিহাসে-এর উত্তর পাবেন, যারা ভাববাদী, কনসেপ্চুয়েল আইডিওলজি, স্টেরিওটাইপ্ড-এটিচিউড ও সকল প্রকার কল্পনাপ্রসূত বিশ্বাস মুক্ত হয়ে, সততার সাথে নিরপেক্ষভাবে কোরান এবং ইসলামের ইতিহাস পড়বেন। সকল মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। এ অত্যন্ত কঠিক কাজ। দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা লম্বা জুব্বা-পরা পুরুষ অথবা আপাদমস্তক বুরকা দিয়ে ঢাকা হিজাব-পরা নারী দেখে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ তার কনসেপ্চুয়েল আইডিয়ওলজির মাধ্যমে কল্পনা করে, এরা অবশ্যই পাক-পবিত্র নিষ্পাপ মানুষ। এদের পকেটে বোমা থাকতে পারে, তা ভাববাদীদের জন্য বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

ইসলাম আজ সারা পৃথিবীর মানুষের আলোচ্য বিষয়। সকলের মুখেই দুটো প্রশ্ন- ১. ইসলাম মানে শান্তি না সন্ত্রাস, ২. কে আসল আর কে নকল মুসলমান? সন্দেহভরা মনে মানুষ দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টায়, না-জানি আজ পৃথিবীর কোথায় কোন নবদম্পতির বিয়ের আসরে, কোন আদালত প্রাঙ্গনে কোন জজের মাথায় ইসলামি বোমা পড়লো। প্রতিটি বোমা যত বিকট আওয়াজে পড়ে, সাথে সাথে ততটুকু বিকট আওয়াজে প্রতিধ্বনি ওঠে, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না, বোমাবাজরা কোরানের অপব্যাখ্যাকারী ইসলামের শত্রু। পবিত্র কোরান স্পষ্ট করে বলে, "এ বিশ্বের একচ্ছত্র সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। আল্লাহর আইন ব্যতীত কারো আইন পৃথিবীতে থাকতে পারে না। কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না।" (সুরা ফাত্‌হ্‌ ৪৮, আয়াত ৭, ১৪; সুরা ফুরকান ২৫, আয়াত ২; সুরা ইমরান ৩, আয়াত ৮৫)। এ হলো মিশন স্টেইটমেন্ট অব ইসলাম। পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে, আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আইন কায়েম করতে যারা জেহাদ করে, তারা 'ওরাসাতুল আম্বিয়া' বা রসুলগণের প্রতিনিধি। যে মিশন নিয়ে জগতে নবী মুহাম্মদের আগমন, নবীর অবর্তমানে সেই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ৫০টি ইসলামি দলসহ পৃথিবীর অন্যান্য জেহাদি সংগঠন। এ সকল ওলামায়ে হাক্কানি কামেল আলেমগণ বাংলাদেশের মসজিদে, হাজার হাজার মুসল্লিদের ইমামতি করে, শতশত মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ তালেবে ইলম, আত্মঘাতী জেহাদী তৈরি করে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন। এরা কেউই সিকি দামের চুনোপুটি অশিক্ষিত কাঠমোল্লা নয়। তাঁদের অনেকেই হাটহাজারি, দেওবন্দ, পাকিস্তান, মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি ও মদিনা ইসলামি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, এমনকি শিক্ষকও। এঁদেরকে যারা সন্ত্রাসী, জঙ্গি, মৌলবাদী বলেন, তাদেরকে নবী মুহাম্মদের (দঃ) ভাষায় বলা হয়-'মুনাফিক'।

আমরা যখন কোরানের সমালোচনা করি তখন কেউ কেউ বলেন, আমরা নাকি ৯/১১-এর আগে অর্থাৎ ২০০১ সালের আগে ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একথা সত্য যে, বিশ্বের অমুসলিম সাধারণ মানুষ, মুসলমান কর্তৃক ঘটিত ৯/১১ এবং ধারাবাহিকভাবে এর পরবর্তী নৃশংস ঘটনার পর বাধ্য হয়েছে কোরান খুলে দেখতে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিত মৌলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদির (উর্দু ভার্সন) 'তাফহিমুল কোরআন' অবলম্বনে নিচে শানে-নুজুলসহ কোরানের দুটো সুরার (সুরা আনফাল ও সুরা তাওবাহ) অনুবাদ দেয়া হলো। সারা বিশ্বজুড়ে বোমাবাজী-হত্যা-সন্ত্রাস পবিত্র জেহাদ না সন্ত্রাস, এবং বর্তমান পৃথিবীর ত্রাস আল-কায়েদা, হরকাতুল জেহাদ, জামাতে

ইসলামি, জামাতুল মুজাহিদিন, হামাস ইত্যাদি ধর্মভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের দালিলিক উৎস কোথায়—এসকল প্রশ্নের উত্তর নির্মোহভাবে জানতে চাইলে ইসলাম ধর্মের পবিত্র কেতাব কোরান শরিফের এ দুটো সুরা পাঠই যথেষ্ট। আগেই বলেছি শুধুমাত্র তারাই কোরানে এর উত্তর পাবেন, যারা ভাববাদী, স্টেরিওটাইপ্ড-এটিচিউড ও সকল প্রকার কল্পনা প্রসূত বিশ্বাসমুক্ত হয়ে, সততার সাথে, নিরপেক্ষভাবে কোরান পড়বেন।

প্রথম সুরাটির নাম 'সুরা আনফাল' (সুরা নম্বর ৮); অপরটির নাম 'সুরা তাওবাহ্' (সুরা নম্বর ৯)। মুহাম্মদ 'সুরা আনফাল' প্রকাশ করেন হিজরী দ্বিতীয় সনে, তাঁর ও কোরায়েশদের মধ্যকার সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর। আর 'সুরা তাওবাহ' বলেছিলেন নবম হিজরীতে, কিছু অংশ 'হুদাইবিয়া' সন্ধির প্রাক্কালে, কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে আর কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। উল্লেখিত সুরা দু'টির শানে-নুজুল বা পটভূমি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক সুরাগুলোতে প্রধানত কি বলা হয়েছে। আমি এখানে প্রথমে 'তাফহিমুল কোরআন' (পৃষ্ঠা ১১৮-১২৭) থেকে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদি কর্তৃক বর্ণীত সুরা আনফালের 'শানে-নুজুল'-এর সারাংশ উল্লেখ করে এই সুরার আয়াতগুলি (সবগুলি আয়াত না নিয়ে) বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য আয়াতগুলি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করছি (পাঠকের এ ব্যাপারে যে কোনো সংশয় তৈরি হলে কোরান শরিফের সাথে আয়াতগুলি মিলিয়ে নিবেন) এবং আয়াতের নিচে এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব মন্তব্য পেশ করছি :

আবুল আ'লা মওদুদি বলছেন-"সুরা আনফাল" হিজরী দ্বিতীয় সালে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যকার সর্বপ্রথম যুদ্ধ, 'যুদ্ধে-বদর'-এর পরে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু সুরাটিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছ, তাই অনুমান করা যায় যে পূর্ণ সুরাটি একই সময়ে নাজিল হয়েছিল। তবে এটাও সম্ভব যে বেশকিছু আয়াত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সমস্যার ওপর নির্দেশনাবলী হিসেবে, পরে বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুনরায় যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সুরাটি বিভিন্ন সময়ে বর্ণীত বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যের সমষ্টি। নবীজির মক্কি জীবনের শেষ পর্যায়ে আরব নেতাগণ ইসলামকে তাদের ধর্মের প্রতি বিরাট হুমকি মনে করে, তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। নানা কারণে মদিনার মানুষ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের চেয়ে অধিক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ইসলামের দ্বাদশ বর্ষে মদিনা থেকে হজের মৌসুমে

পচাত্তরজন লোকের একটি প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেননি বরং নবী করিম (দঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণকে মদিনায় আশ্রয় দিবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। আল্লাহর নবী (দঃ) এমন সুবর্ণ সুযোগটি দু-হাত বাড়িয়ে সাদরে গ্রহণ করে নিলেন এবং একদিন মদিনাতেই আরব দেশের 'প্রথম ইসলামের রাজধানী' প্রতিষ্ঠিত করেন।

কোরায়েশগণ বুঝতে পারলেন, খুব শীঘ্রই মুহাম্মদ (দঃ) দেশত্যাগ করে চলে যাবেন। তারা এক জরুরি বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, বনি-হাশিম ছাড়া কোরায়েশ বংশের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক নেয়া হবে আর এরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করবে। কিন্তু তারা কোন প্রকার অনিষ্ট করার আগেই আল্লাহর কৃপায় নবীর (দঃ) সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। নবীজি (দঃ) নিরাপদে মদিনায় চলে যেতে সক্ষম হলেন।
মদিনার এক নেতৃস্থানীয় লোক সা'দ বিন মুয়াজ যখন ওমরাহ হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন, মক্কার দ্বার-প্রান্তে আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন-'তুমি কি মনে করো তোমাকে শান্তিতে হজ্ব করতে দেয়া হবে, যখন তোমরা আমাদের দুশমনদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছো এবং নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছো? তুমি যদি উমাইয়া বিন কাহাফের অতিথি না হতে আল্লাহর কসম এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না।' সা'দ বললেন-'আবু জেহেল, আল্লাহর কসম, তুমি যদি হজ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাদেরকে এমন এক জায়গায় বাধা দেবো, যা হবে তোমাদের জীবনমরণ সমস্যা। আমরা মদিনার কাছে তোমাদের বাণিজ্য-পথ বন্ধ করে দেবো'।
মদিনায় আসার পর মুসলমানদেরকে সঙ্গবদ্ধ করা ও মদিনার সম্ভ্রান্ত ইহুদিদের সাথে সমঝোতার প্রাথমিক কাজগুলো সেরেই মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম এই বাণিজ্যপথের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথমে বাণিজ্যপথ ও লোহিত সাগর মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে শান্তিচুক্তি বা মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র যারা সমুদ্র উপকূল ও পাহাড়ি এলাকায় বাস করতেন তাদের সাথে তাবলীগের মাধ্যমে (মিশনারি কাজ) জোটবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেন। উভয় কাজেই নবী (দঃ) পূর্ণ সফলকাম হন। তারপর এই বাণিজ্যপথ ধরে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি হুশিয়ারি স্বরূপ ছোট ছোট দলের অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। একটি অভিযানে নবীজি (দঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হিজরিতে

চারটি অভিযানের প্রথম অভিযান হামজা, দ্বিতীয় অভিযান উবায়দা বিন হারিস, তৃতীয় অভিযান সা'দ বিন আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসুল (দঃ)। দ্বিতীয় হিজরীতে আরও দুটি অভিযান সেখানে পাঠানো হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সবগুলো অভিযানের কোনোটিতেই কারো সাথে কোনো প্রকার সংঘাত বা রক্তপাত হয়নি এবং কোনো বণিকদলকে আক্রমণ বা কারো মালপত্র লুন্ঠন করা হয়নি।

দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে আবু-সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে কোরায়েশদের বিরাট এক ব্যবসায়ীদল সিরিয়া থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কা ফেরার পথে মদিনার অভ্যন্তরে এমন একটি এলাকায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে আক্রমণ করা মদিনাবাসীর জন্যে খুবই সহজ। আবু-সুফিয়ান তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলেন মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমণ করবে। তার ভয় হলো, মাত্র ৩০/৪০জন লোকের হেফাজতে বিরাট মূল্যের মালপত্র নিয়ে মদিনা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আবু সুফিয়ান সাহায্যের জন্যে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন। লোকটি মক্কায় পৌঁছে চিৎকার করে ঘোষণা করলো-"মক্কাবাসী, তোমাদের বণিকদল মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন, মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বণিক-দলের নিকবর্তী হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা অতিশীঘ্র বেরিয়ে না পড়ো, আমি জানি না তোমারা তোমাদের মালপত্র উদ্ধার করতে পারবে কি-না।" এই সংবাদে কোরায়েশগণ ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তাদের বড় বড় নেতাগণ তাতক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতির ডাক দিলেন। আনুমানিক ১০০০ সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা মদিনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বণিকদলকে উদ্ধার করাই নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যাতে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে মদিনায় তাদের বিপরীত নতুন শক্তির উত্থান চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া আর মদিনার বাণিজ্যপথ কোরায়েশদের জন্যে চির উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা। আল্লাহর রসুল (দঃ) যিনি সব সময়ই দেশের সার্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ভাবলেন এবার সময় এসে গেছে চূড়ান্ত ফয়সালার। আর এখনই শক্ত-কঠিন সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার সেই উৎকৃষ্ট সময়। অন্যথায় নতুন ইসলামের উদিত আলো পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে, ইসলাম আর কোনদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবে না। এদিকে মাত্র দুই বৎসর হলো মক্কা থেকে আগত মুহাজিরীনগণ মদিনায় এসেছেন। তখনো অর্থনৈতিকভাবে তারা ছিলেন খুবই দুর্বল। মদিনার আনসারগণও কোন প্রকার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হননি। তখন মুসলমানদের প্রতি ছিল স্থানীয় ইহুদিদের বৈরী মনোভাব, পার্শ্ববর্তী এলাকার কাফেরগণ ছিল

কোরায়েশদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আর স্বয়ং মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একদল মানুষ ছিল মুনাফিক। এমতাবস্থায় কোরায়েশগণ যদি মদিনা দখল করে নেয় তাহলে হয়তো দুনিয়া থেকে মুসলমান জাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোরায়েশগণ মদিনা দখল না করে শুধু তাদের বাণিজ্য-কাফেলাকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, আর মুসলমানগণ বসে বসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাও হবে মুসলমানদের জন্যে চরম অপমান। কারণ এভাবে সকল কাফের, মুশরিক, ইহুদিসহ সারা আরব বিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর মদিনার মুনাফিকেরা প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেবে। তখন মুসলমানদের জান-মাল, বাড়ি-ঘর, মান-সম্মানের কোন নিরাপত্তাতো থাকবেই না, মুহাজিরীনদের জন্যে মদিনায় বাস করাও হয়ে যাবে অসম্ভব। সেই সুযোগে কোরায়েশগণ আধিপত্য করবে সারা আরব জগতে। আল্লাহর রসুল (দঃ) এ সকল দিক বিবেচনা করেই অস্ত্রের মাধ্যমে কোরায়েশদের মোকাবিলা করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি মক্কার মুহাজিরীন ও মদিনার আনসারগণকে এক জরুরি বৈঠকে সমবেত করলেন। সকলের সামনে সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে নবীজি (দঃ) বললেন-'উত্তর দিকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফেলা, আর দক্ষিণ দিকে মক্কা থেকে একদল সসস্ত্র সেনাবাহিনী মদিনাভিমুখে আসছে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এই দুই দলের যে কোন একটি তোমাদের হস্তগত হবে। তোমরা এদের কোন্ দলকে আক্রমণ করবে'? বেশিরভাগ লোক বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করতে চাইলেন কিন্তু নবিজীর (দঃ) মনে ছিল অন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা। রসুল (দঃ) তাঁর গোপন ইচ্ছে প্রকাশ না করে একই প্রশ্ন পুনরায় যখন করলেন, মক্কার মুহাজিরীনদের একজন, মিকাদ বিন আমর দাঁড়িয়ে বললেন-'হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনি যে দিকে চাইবেন আমরা সে দিকেই যেতে রাজি আছি'। মদিনার মুসলমানগণকে নীরব নিরুত্তর দেখে নবীজি (দঃ) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তখনো প্রকাশ করলেন না। আনসারদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতীত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক হবে না। মদিনার মুসলমানগণ ইতিপূর্বে ইসলামি কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। এখন সুযোগ এসেছে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল বিসর্জন দিতে রাজি, তা প্রমাণ করার। রসুল (দঃ) মদিনার আনসারগণকে সরাসরি প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে পুনরায় একই প্রশ্ন ব্যক্ত করলেন। এ পর্যায়ে এসে মদিনার সা'দ বিন মুয়াজ দাঁড়িয়ে বললেন-'হুজুর, প্রশ্নটি মনে হয় যেন আমাদেরকেই করা হয়েছে'। রসুল (দঃ) বললেন-'হ্যাঁ। সা'দ বিন্ মুয়াজ বললেন-'আমরা আপনাকে নবী বলে বিশ্বাস করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি আপনি যা বলবেন তা

সত্য বলে মনে নেবো। সুতরাং হে আল্লাহর রসুল (দঃ) আপনার ইচ্ছেই পূরণ করা হউক, আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে যেতে বললেও আমরা সেদিকে যেতে প্রস্তুত আছি। আর আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি কাল যদি আপনি যুদ্ধের আহ্বান করেন, আমাদের একজন মানুষও পেছনে পড়ে থাকবে না'। এরপর সিদ্ধান্ত হয় যে, বাণিজ্য-কাফেলাকে আক্রমণ নয়, বরং যুদ্ধের ময়দানে কোরায়েশদের মোকাবিলা করা হবে।

চলবে-